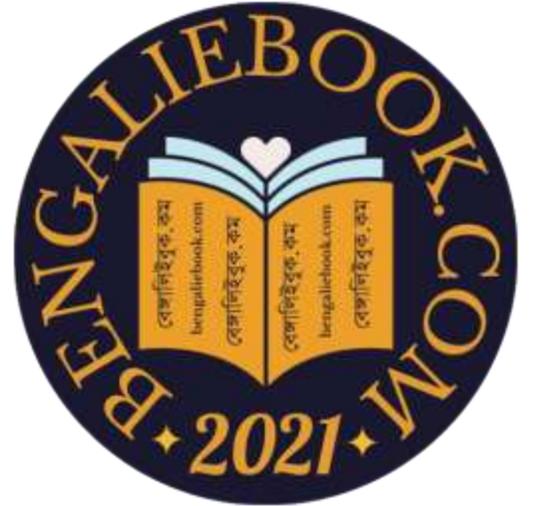


প্রবন্ধ

স্বপ্নচরিত্র

বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পঞ্চম খণ্ড



সূচিপত্র

- প্রথম পরিচ্ছেদ—মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ.....2
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সঞ্জয়যান.....9
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ—যানসন্ধি.....16
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ—শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা- যাত্রার প্রস্তাব.....19
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ—যাত্রা.....23
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—হস্তিনায় প্রথম দিবস.....26
- সপ্তম পরিচ্ছেদ—হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস.....32
- অষ্টম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণকর্ণসংবাদ.....38
- নবম পরিচ্ছেদ—উপসংহার.....41

প্রথম পরিচ্ছেদ—মহাভারতের যুদ্ধের

অন্যোদ্যোগ

এক্ষণে উদ্যোগপর্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্বদাই করিতেছে। সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মূখ্য কার্য। রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্র আইন আদালত সকলেরই একটি মূখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে দুইটি মত আছে। এক মত এই যে :—দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে—আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটি পরস্পর বিরোধী—কাজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পরিহার্য, এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহা সামঞ্জস্যে অদ্যাপি পৌঁছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খ্রীষ্টধর্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ।

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগপর্বমধ্যে প্রধান তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই তাহার মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্যোগপর্বের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ কার্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। যে তাঁহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, তিনি বলপ্রয়োগপূর্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে, যেখানে

ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযোজ্য, তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাজুখ হয়, তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্য সমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, আইন-আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বলপ্রয়োগ ধর্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই সকল কূট তর্ক উঠিয়া থাকে। কার্যতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, যে বলবান, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায়। যে দুর্বল, যে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান, অথচ ক্ষমাবান, তাহার কি করা কর্তব্য, অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগপর্বের আরম্ভেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি।

ভরসা করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাণ্ডবেরা দ্যুতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দুর্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যদি অজ্ঞাতবাসের ঐ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাঁহারা রাজ্য পুনর্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্বার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দুর্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া, বিরাটরাজের পুরীমধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন; ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাঁহার দুর্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দুর্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয়, তবে কি করা কর্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাটরাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও

বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডবদিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বিরাটরাজের সভায় আসীন হইলে, পাণ্ডব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ “শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।” তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া, তারপর বলিলেন, “এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।”

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেন না, হিত, ধর্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্বীর বুঝাইয়া বলিতেছেন, “ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন।” আমরা পূর্বে বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না—বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজবিধ্বংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তারপর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্মিকতা এবং ইঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনাপূর্বক ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্থ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অর্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিতস্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জিত, তাহা অর্থই নহে। সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে, সাত্যকি গাত্রোথান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সে কালেও “Parliamentary procedure” ছিল) প্রতিবক্তৃত্ব করিলেন। সাত্যকি নিজে মহাবলবান্ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের মধ্যে অর্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লীব কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যুতক্রীড়ার জন্য বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে, যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নির্মূল করাই কর্তব্য।

তারপর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃত্ব। দ্রুপদও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, দুর্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক।

পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্বীর বক্তৃত্ব করিলেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুজন, এই জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, “কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্যাদালঙ্ঘনপূর্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাত্মদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।” গুরুজনকে ইহার পর

আর কি ভৎসনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, “যদি দুর্যোধন সন্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন,” অর্থাৎ “এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।” এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন।

আমরা দেখিলাম যে, কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি, তজ্জন্য অর্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব পাণ্ডবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য, উভয়ের সহিত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে এই দুই কথাই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্যোধনও তাই করিলেন। দুই জনে এক দিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

“বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্বক বিনীত ও কৃতাজ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুর্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, ‘হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচর প্রতিপালন করুন।’

কৃষ্ণ কহিলেন, ‘হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত।’ এই বলিয়া ভগবান্ যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন—‘হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্বুদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাজুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদয়তর, তাহাই অবলম্বন করি।’

ধনঞ্জয় অরাতিমর্দন জনার্দন সমরপরাজুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাঁহারে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্যোধন অর্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাজুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।”

উদ্যোগপর্বের এই অংশ সমালোচনা করিয়া আমরা এই কয়টি কথা বুঝিতে পারি।

প্রথম—যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধর্মার্থসংযুক্ত অধিকার পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগযুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তারপর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে এক পক্ষে বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে।

আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু,

এবং যিনি একাই সর্বত্র সমদর্শী, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা, অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডবপক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

তারপর, নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জুন যুদ্ধের কোন্ কার্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কার্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্বদোষশূন্য এবং সর্বগুণাশ্রিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সঞ্জয়মান

উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। কেন না, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রবেদ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জুন ও কৃষ্ণকে[1] ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। “তোমাদের রাজ্যও আমরা অধর্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমরা তজ্জন্য যুদ্ধও করিও না, সে কাজটা ভাল নহে,” এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার স্থূলমর্ম এই যে, “যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর্ম, তোমরা সেই অধর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব তোমরা বড় অধার্মিক!” যুধিষ্ঠির, তদুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয়, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

“হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক এই সকলও অধর্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্মপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার স্বধর্ম পরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্তব্য। মহাপ্রভুর শিনির নপ্তা এবং চেদি, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শত্রু দমনপূর্বক সুহৃদগণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ত্রাতা ও কর্তা

বলিয়া কাশীশ্বর বন্দ্র উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারিদান করে, তদ্রূপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্মনিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদাচ ইঁহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।”

বাসুদেব কহিলেন, “হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয়, ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণদিগের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্ধিত হইবে, তাহার আশ্চর্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্মসাধনোদ্যত উৎসাহসম্পন্ন স্বজন-পরিচালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্মিক বলিয়া নির্দেশ করিলে?”

এই পর্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে বড় প্রয়োজনীয়। আমরা বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের কাজ দুইটি—ধর্মরাজ্য-সংস্থাপন এবং ধর্মপ্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্মরাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত গীতা-পর্বাধ্যায়েই আছে। এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম যে কৃষ্ণ-প্রচারিত, কি গীতিকার-প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতা-পর্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধর্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধর্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে, মহাভারতকায় যে

ধর্মব্যখ্যা যে স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে, সেই ধর্ম প্রচলিত ধর্ম হইতে ভিন্নপ্রকৃতির ধর্ম, তবে বলিব, এই ধর্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে গীতায় যে ধর্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে, গীতোক্ত ধর্ম যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত বটে।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন।

“শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্মবশতঃ কেহ বা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তির জল পান করিবামাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কর্মই সর্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়।

“দেখ, দেবগণ কর্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী-পরিবৃত হইয়া মাসার্ধ উদিত হইতেছেন, হুতাশন কর্মবলে প্রজাগণের কর্মসংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; স্রোতস্বতী সকল কর্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছেন; অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্মবলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে

ভোগাভিলাষ বিসর্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালনপূর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব, যক্ষ, অঙ্গর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন।”

কর্মবাদ কৃষ্ণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Duty, বলেন— সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্মে “কর্ম” শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি, কর্ম শব্দের পূর্বপ্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

অনুষ্ঠেয় কর্মের যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাৎ ডিউটির সম্পাদনের নামান্তর স্বধর্মপালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মপালনে অর্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা,

“হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয়জ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথচালনে সুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনাকে সান্ত্বনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্মরক্ষা ও পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইঁহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম প্রতিপালনপূর্বক স্বকর্ম সংসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়সাধন বিবেচনা করিতে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,

ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্মরক্ষা হয়, কি যুদ্ধ না করিলে ধর্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।”

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বাণের ধর্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যেরূপ ধর্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতে অন্যত্রও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম, এবং মহাভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম—সে ধর্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত, এমন নহে—যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম, ইহা এক প্রকার সিদ্ধা। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিব।

ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম কিছুই নাই। উহার নাম “Conquest,” “Glory,” “Extension of Empire” ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপহরণের গুণানুবাদ। শুধু এক “Glorie” শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড্রীক তিন বার ইউরোপে সমরানল জ্বালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপাসু রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই বোধ হয় যে, এইরূপ “Glorie” ও তস্করতাতে প্রভেদ আর কিছুই নাই—কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর।[2] কিন্তু এ কথাটা বলা বড় দায়, কেন না, দিগ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে যে, আর্য ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময় ধর্মাধর্ম ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল Diogenes মহাবীর আলেকজণ্ডরকে বলিয়াছিলেন, “তুমি এক জন বড় দস্যু মাত্র।” ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিতেছেন,—তাঁহার মতে ছোট চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন,

“তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে সর্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয়। সুতরাং দুর্যোধনের কার্যও একপ্রকার তস্করকার্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।”

এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism। উভয়েরই দেশীয় নাম

স্বধর্মপালন। কৃষ্ণ বলিতছেন, “এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।”

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন, “তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে (যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্মোপদেশ প্রদান কর নাই।” কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্তনকালে বড় স্পষ্টবক্তা। সত্যই সর্বকালে তাঁহার নিকট প্রিয়।

সঞ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ স্বয়ং হস্তিনা নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, “যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে, সুমহৎ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।”

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দুষ্কর কর্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্যশক্তিতে দুষ্কর কর্ম, কেন না, এক্ষণে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়া শত্রুপুরীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

1 বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্বপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্যোগপর্বে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুদিগের অন্যান্য সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, “বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?” (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, “সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডুদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া দ্বৈরথযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে

সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবার্থ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কার্য অনুক্ষণ স্মরণ করতঃ আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন গুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।” আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন কিন্তু “কেশবও অধৃষ্য, লোকত্রয়ের অধিপতি এবং মহাত্মা। যিনি সর্বলোকে একমাত্র বরেণ্য, কোন্ মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিবে?” এইরূপ অনেক কথা আছে।

2 তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কথা হইতে পারে। সেরূপ কার্যের বিচারে আমি সক্ষম নহি-কেন না, রাজনীতিজ্ঞ নহি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—যানসন্ধি

এইখানে সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায়, কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় গমন করিলেন বটে। কিন্তু সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায় ও ভগবদ্যান-পর্বাধ্যায়ের মধ্যে আর তিনটি পর্বাধ্যায় আছে; “প্রজাগর”, “সনৎসুজাত”, এবং “যানসন্ধি”। প্রথম দুইটি প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই—অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম ও নীতিকথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং ঐ দুই পর্বাধ্যায়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।

যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায় ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা বলিলেন, এবং তচ্ছবণে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই কথিত আছে। বক্তৃত্তা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক সময়ে নিস্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে।

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অর্জুনবাক্য সঞ্জয়—মুখে শুনিয়া, আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্তন কর।”

তদুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বলিয়া, এক আঘাতে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন যে, তিনি পাটিপি পাটিপি,—অর্থাৎ চোরের মত; পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া কৃষ্ণার্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন, কৃষ্ণার্জুন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অর্জুন, দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন। কথাবার্তা নূতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দম্ভের কথা বলিলেন,—বলিলেন, “আমি যখন সহায়, তখন অর্জুন সকলকে মারিয়া ফেলিবে।”

তার পর অর্জুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, “অনন্তর মহাবীর কিরীটী তাঁহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।” এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বুঝি ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জুন যাহা বলিলেন, তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিক্ দিয়া ঊনষষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। ষষ্টিতম অধ্যায়ে দুর্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিন্তু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া বক্তৃতা করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। দ্বিষষ্টিতমে দুর্যোধনে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। ত্রিষষ্টিতমে ভীষ্মের বক্তৃতা। চতুষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অর্জুন কি বলিলেন? তখন সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়া দিয়া অর্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি, কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধ্যায়গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে—পরবর্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, ইহা কেবল অপ্ৰাসঙ্গিক এবং অসলংগ্ন এমন নহে, পূর্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সকল বৃত্তান্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বা পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ হয়, কোন রসিক লেখক, অসুরনিপাতন শৌরি এবং সুরনিপাতিনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্র উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

যানসন্ধি-পর্বাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততম পর্যন্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্বে যাঁহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন কিছু নাই যে, তাহার বলে আমাদের বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের নিস্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষ-চরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য।

এইখানে যানসন্ধি পর্যাধ্যায় সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার

প্রস্তাব

শ্রীকৃষ্ণ, পূর্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী, সকলেই তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কবি ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে বলাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কৃষ্ণের পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, “হে মহারাজ, ব্রহ্মচর্যাদি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষ্যচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরাতিনিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন।”

গীতাতেও অর্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা যায়। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পূর্বে বুঝান গিয়াছে। পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে বলিতেছেন, “মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগপূর্বক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগপূর্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না।

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে।* অর্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন,

“উর্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্যসিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।”

এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেন। কেন না, তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্মসাধনে প্রবৃত্ত। ঐশী শক্তির দ্বারা কর্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলিতেছেন—

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।”

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্ না শুনাক্, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত ইহাও আমি জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে বুঝাইয়াছি।

দ্রৌপদীর এই বক্তৃতার উপসংহারকালে এক অপূর্ব কবিত্ব-কৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

“অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়া কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্বগন্ধাধিবাসিত, সর্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভূজগসদৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দন! দুরাত্মা দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধি স্থাপনের মত প্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভীমার্জুন দীনের ন্যায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প

হইয়াছেন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুরে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত ও পাংশুলুষ্ঠিত না দেখিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পূর্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধর্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

“নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদগদস্বরে কম্পিতকলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, দ্রবীভূত হতাশনের ন্যায় অতুষ্ণ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহারে সান্ত্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি অতি অল্প দিন মধ্যেই কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের জ্ঞাতি বান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জুন নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে। যদি হিমবান্ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহের সহিত নিপতিত হয়, তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সংবরণ কর, আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।”

এই উক্তি শোণিতপিপাসুর হিংসাপ্রবৃত্তিজনিত বা দ্রুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। যিনি সর্বত্রগামী সর্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতেছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদুক্তি মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, দুর্যোধন রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণপূর্বক সন্ধি স্থাপন করিত কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরব-সভায় গমনের জন্য উদ্যোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয়,

তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার মুখবিনির্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ম। তিনি নিজেই অর্জুনকে শিখাইয়াছেন যে,

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

সেই নীতির বশবর্তী হইয়া, আদর্শযোগী ভবিষ্যৎ জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের চেষ্টায় কৌরব-সভায় চলিলেন।

* সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে || ২ || ৪৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—যাত্রা

যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কালোচিত। তিনি “রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্তে কৌরব-সভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাজল্য পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন; এবং বৃষলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্য সকল সন্দর্শনপূর্বক” যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকর্মপরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, ধর্মান্বিতা, এবং অস্বার্থপর হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পূজা তাঁহাদের ন্যায় প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্য তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপ পূজা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিমধ্যে ঋষিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি।

“মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দূর গমন করিয়া পথের উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! সমুদায় লোকের কুশল? ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্ কার্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? “তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ

কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেক বার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদায় ক্ষত্রিয়, সভাসদ ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরবসভামধ্যে আপনার মুখবিনির্গত ধর্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন, আমরা সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

“এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনারে সভামণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথোপকথন করিব।”

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্বগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। পুরাণের দশাবতারবাদ কত দূর সঙ্গত তাহা আমরা গ্রন্থান্তরে বিচার করিব।

এই হস্তিনাযাত্রার বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও পূজ্য ছিলেন। হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

“দেবকীনন্দন সর্বশস্যপরিপূর্ণ অতি রম্য সুখাস্পদ পরম পবিত্রশালিভবন এবং অতি মনোহর ও হৃদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশু সন্দর্শন করতঃ বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্যপ্রহৃষ্ট অনুদ্বিগ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পশ্চিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে তাহারা বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

“এদিকে ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃকঙ্কলে সমুপস্থিত হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্বক যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ

শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্যা ও গাত্র হইতে সমুদায় যোক্তাদি মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারে জনগণকে কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ! অদ্য যুধিষ্ঠিরের কার্যানুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল। অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্মাবলম্বী আর্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অরাতিকুলকালান্তক মহাত্মা হ্রষীকেশের সমীপে আগমনপূর্বক বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও আশীর্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাহাদিগকে অর্চনপূর্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন।

ইহা নিতান্তই মানুষচরিত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যের চরিত্র।

দেখা যাইতেছে যে, দেবতা বলিয়া কেহ তাঁহাকে পূজা করিতেছে, এমন কথা নাই। তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্য যেরূপ পূজা পাইবার সম্ভাবনা, তাহাই তিনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—হস্তিনায় প্রথম দিবস

কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া, যুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী রকম উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। নানারত্নসমাকীর্ণ সভা সকল নির্মাণ করাইলেন, এবং তাঁহাকে উপটোকন দিবার জন্য অনেক হস্ত্যশ্বরথ, দাস, “অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী,” মেঘ, অশ্বতরী, মণিমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বিদুর দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, “ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধার্মিক, তেমনই বুদ্ধিমান। কিন্তু রত্নাদি দিয়া কৃষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না। তিনি যে জন্য আসিতেছেন, তাহা সম্পাদন কর; তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার বশ হইবেন না।”

ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত, এবং বিদুর সরল; দুয়োঁধন দুই। তিনি বলিলেন, “কৃষ্ণ পূজনীয় বটে, কিন্তু তাঁহার পূজা করা হইবে না। যুদ্ধ ত ছাড়িব না; তবে তাঁর সমাদরে কাজ কি? লোকে মনে করিবে, আমরা ভয়েই বা তাঁহার খোশামোদ করিতেছি। আমি তদপেক্ষা সৎ পরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিব। পাণ্ডবের বল বুদ্ধি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আটক থাকিলে পাণ্ডবেরা আমার বশীভূত থাকিবে।”

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ দূত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম দুয়োঁধনকে কতকগুলো কটুক্তি করিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

নাগরিকেরা, এবং কৌরবেরা বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনীত করিলেন। তাঁহার জন্য যে সকল সভা নির্মিত ও রত্নজাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্রভবনে গমন করিয়া কুরুসভায় উপবেশনপূর্বক, যে যেমন যোগ্য, তাহার সঙ্গে সেইরূপ সৎসম্ভাষণ করিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু এক দীনভবনে চলিলেন।

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের এক রকম ভাই। উভয়েরই ব্যাসদেবের ঔরসে জন্ম। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্র; বিদুর তাহা নহে। তিনি, বিচিত্রবীর্যের দাসী এক বৈশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ ধরিলেও, তাঁহার জাতি নির্ণয় হয় না। কেন না, ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম।[1] তিনি সামান্য ব্যক্তি কিন্তু পরম ধার্মিক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া, তাঁহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য, আজিও এ দেশে “বিদুরের খুদ,” এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাণ্ডবমাতা কুন্তী, কৃষ্ণের পিতৃষসা, সেইখানে বাস করিতেন। বনগমনকালে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করিতে গেলেন। কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধুর দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মনুষ্য-চরিত্রের সর্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না। মূর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

“পাণ্ডবগণ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হইবেন না। বীরব্যক্তির হই অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।”

“রাজ্যলাভ বা বনবাস”[2] এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে না। বুঝিলে, এত দুঃখ থাকিত না। যে দিন বুঝিবে, সে দিন আর দুঃখ থাকিবে না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়া পাখির মত কিচির মিচির করি।

কৃষ্ণ কুন্তীকে আরও বলিলেন, “আপনি তাহাদিগকে শত্রুবিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।”

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না—যুদ্ধ হইবে। তথাপি সন্ধি স্থাপন জন্য হস্তিনায় আসিয়াছেন; কেন না, যে কর্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্তব্য সাধন করিতে হয়। ইহাকেই তিনি গীতায় কর্মযোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মনুষ্যের হিতকর; এই জন্য সন্ধি স্থাপন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অর্জুনের প্রধান উৎসাহদাতা ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্ম। অতএব যে কর্মযোগ তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাঁহার আদর্শ চরিত্র পুঞ্জানুপুঞ্জ সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই এত প্রয়াস পাইতেছি।

কৃষ্ণ, কুন্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্বীর কৌরব-সভায় গমন করিলেন। সেখানে গেলে, দুর্যোধন তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। দুর্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে লৌকিক নীতিটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, “দূতগণ কার্যসমাপনান্তে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।” দুর্যোধন তবুও ছাড়ে না; আবার পীড়াপীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন,

“লোকে হয় প্রীতিপূর্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে আমারে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই; আমিও বিপদগ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব?”

ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একটা সামান্য কর্ম; কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবন, সচরাচর কতকগুলো সামান্য কর্মের সমবায় মাত্র। সামান্য কর্মের জন্য একটা নীতি আছে অথবা থাকা উচিত। বৃহৎ কর্ম সকলের নীতির যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কর্ম সকলের নীতিরও সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি ধর্ম। তবে উন্নতচরিত্র মনুষ্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতার এই প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেতা ধর্মে পরাজুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবর্তী হইতে সক্ষম করেন না, কেন না, নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুদ্র বিষয়েও নীতির ভিত্তি

অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব দুর্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পষ্ট কথা পরুষ হইলেও তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্মানুমত হয়, সেখানেও তাহা পরুষ বলিয়া আমরা পরাজুখ। এই ধর্মবিরুদ্ধ লজ্জা অনেক সময়ে আমাদেরকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধর্মে বিপন্নও করে।

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া বিদুরের ভবনে গমন করিলেন।

বিদুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে; কেন না, দুর্যোধন কোন মতেই সন্ধি স্থাপন করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাহার উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ হয়।”

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাঙ্করে লিখিয়া রাখা উচিত। সিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ পড়ে না। কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন,

“যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান্ না হন, পণ্ডিতগণ তাঁহারে নৃশংস বলিয়া কীর্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। * * * * যদি তিনি (দুর্যোধন) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই; প্রত্যুত আত্মীয়কে সদুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনুগ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জাতিভেদ সময়ে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি কখনও আত্মীয় নহে।”

ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরস্ত্রীলুন্ধ পাপিষ্ঠ গোপ; এ দেশের লোকের কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে, তিনি মনুষ্যহত্যার জন্য অবতীর্ণ, কাহারও বিশ্বাস, তিনি “চক্রী”—অর্থাৎ স্বাভিলাষসিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে এ সকল নহেন—তিনি যে তৎপরিবর্তে লোকহিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ধর্মোপদেশীর শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মনুষ্য—ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধৃত করিতেছি।

1 মহাভারতীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের প্রপিতামহী, সত্যবতী, দাসকন্যা। ভীষ্মের মার জাতি লুকাইবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্য তিনি গঙ্গানন্দন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধীবরনন্দিনীর কানীনপুত্র। অতএব পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ যে, এখনকার দিনে, তাঁহারা সর্বজাতির অপাংক্তেয় হইতেন। পাণ্ডুর পুত্রগণ, কুন্তীর গর্ভজাত বটে, কিন্তু বাপের বেটা নহেন; পাণ্ডু নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম। তাঁহারা ইন্দ্রাদির ঔরস পুত্র বলিয়া পরিচিত। এদিকে দ্রোণাচার্যের পিতা ভরদ্বাজ ঋষি, কিন্তু মা একটা কলসী; কলসীর গর্ভধারণ যাঁহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাঁহারা দ্রোণের মাতৃকুল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হইবেন। পাণ্ডবদিগের পিতা সম্বন্ধে যত গোলযোগ, কর্ণ সম্বন্ধেও তত-বেশীর ভাগ তিনি কানীন। দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বাপ মা কে, কেহ বলিতে পারে না; তাঁহারা যজ্ঞোদ্ধৃত।

এ সময়ে কিন্তু, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের কথা বলিতেছি না। অনেক ঋষির ধর্মপত্নীও ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন; যথা, অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা, ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী শান্তা, ঋচীকভার্যা, জমদগ্নির ভার্যা (কেহ কেহ বলেন পরশুরামের ভার্যা) রেণুকা ইত্যাদি। এমনও কথা আছে যে, পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিলে, ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে পরবর্তী ক্ষত্রিয়েরা জন্মিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী, ক্ষত্রিয় যযাতির ধর্মপত্নী। আহালাদি সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, পরস্পরের অন্তভোজন করিতেন।

2 মিলটনের ক্ষুদ্রচেতা সয়তান্ বলিয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষা বরং নরকে রাজত্ব শ্রেয়ঃ। আমি জানি যে, আমার এমন পাঠক অনেক আছেন, যাঁহারা এই ক্ষুদ্রোক্তির সঙ্গে উপরিলিখিত মহতী বাণীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে আশাশূন্য লঘুচেতা, পরের প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারে না। মহাত্মা,

কর্তব্যানুরোধে তাহা পারেন, কিন্তু মহাত্মা জানেন যে, মহাদুঃখ বা মহাসুখ ব্যতীত, তাঁহার
বহুবিস্তারাকাজিফণী চিত্তবৃত্তি সকল স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস

পরদিন প্রাতে স্বয়ং দুর্যোধন ও শকুনি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিদুরভবন হইতে কৌরবসভায় লইয়া গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবর্ষি, এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাগ্মিতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। ঋষিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে কিছু হইল না। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, “আমার সাধ্য নহে, দুর্যোধনকে বল।” দুর্যোধনকে কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বুঝাইলেন। সন্ধি স্থাপন দূরে থাক, দুর্যোধন কৃষ্ণকে কড়া কড়া শুনাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। দুর্যোধনের দুঃশরিত্র ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্যোধন উঠিয়া গেলেন।

তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মূলসূত্র, তদনুসারে কার্য করিতে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাজশাসনের মূলসূত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ দুষ্কৃতকারীকে দণ্ডিত করিবে। অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বন্ধ না করিল তাহার পাপাচরণে বহুসংস্র প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বন্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজা ও রাজমন্ত্রী পরামর্শ করিয়া এই জন্য খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দে নাপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জন্য মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দুর্যোধনকে বাঁধিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করুন। তিনি নিজে, সমস্ত যদুবংশের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরণও দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ পরামর্শ গৃহীত হইল না।

এদিকে দুর্যোধন রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত ও প্রিয়; অস্ত্রবিদ্যায় অর্জুনের শিষ্য, এবং প্রায় অর্জুনতুল্য বীর। ইঙ্গিতজ্ঞ

মহাবুদ্ধিমান্ সাত্যকি এই মন্ত্রণা জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতর যাদববীর কৃতবর্মাকে সসৈন্য পুরদ্বারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে এই মন্ত্রণা জানাইলেন। এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

“যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ জনার্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন।” ইত্যাদি।

পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি। তিনি বলশালী, সুতরাং ক্রোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

“শুনিতেছি, দুর্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্বক নিগৃহীত করিবেন। কিন্তু আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইঁহাদিগকে আক্রমণ করি, কি ইঁহারা আমাকে আক্রমণ করেন। আমার এরূপ সামর্থ্য আছে, যে আমি একাকী ইঁহাদিগকে সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম করিব না। আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃতকার্য করিতেছেন। আমি অদ্যই ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদিগের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পারি। তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত গর্হিত কার্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্যোধনের ইচ্ছানুসারে কার্য করুক।”*

এই কথার পর ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে ডাকাইয়া আনাইলেন, এবং তাঁহাকে অতিশয় কটুক্তি করিয়া ভৎসনা করিলেন। বলিলেন,

“তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয়; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধুবিগর্হিত, পাপাচরণে সমুৎসুক হইয়াছ। কুলপাংশুল মূঢ়ের ন্যায় দুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্ধর্ষ জনার্দনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের দুরাক্রম্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব, অসুর ও উরগগণ যাঁহার সংগ্রাম

সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বৎস! হস্তদ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না; পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না; মস্তক দ্বারা কখন মেদিনী ধারণ করা যায় না; এবং বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।”

তারপর বিদুরও দুর্যোধনকে ঐরূপ ভৎসনা করিলেন। বিদুরের বাক্যাবসানে, বাসুদেব উচ্চহাস্য করিলেন, পরে সাত্যকি ও কৃতবর্মার হস্ত ধারণপূর্বক কুরুসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই পর্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্‌যান-বৃত্তান্ত, সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক; কোন গোলযোগ নাই। অতিপ্রকৃত কিছুই নাই ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু অঙ্গুলিকণ্ঠয়ন-নিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারে না। এমন একটা মহদ্ব্যাপারের ভিতর একটা অনৈসর্গিক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রবিষ্ট করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি, এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা, কৃষ্ণের হাস্য ও নিষ্ক্রান্তির মধ্যে একটা বিশ্বরূপ প্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ভগবদ্‌গীতা-পর্বাধ্যায়ে তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বিশ্বরূপপ্রদর্শন বর্ণিত আছে। সেই বিশ্বরূপ-বর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ! গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া দুর্লভ। আর ভগবদ্‌যান-পর্বাধ্যায়ে এই বিশ্বরূপবর্ণনা যাঁহার রচিত, কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। ভগবদ্‌গীতার একাদশে পড়ি যে, ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্বে নিরীক্ষণ করে নাই।” কিন্তু তৎপূর্বেই এখানে দুর্যোধনাদি কৌরবসভাস্থ সকল লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করিল। ভগবান্ গীতার একাদশে, আরও বলিতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না।” কিন্তু কুকবির হাতে পড়িয়া, এখানে বিশ্বরূপ যার তার প্রত্যক্ষীভূত হইল। গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, “অনন্যসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমাদের এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমারে দর্শন ও

আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।” কিন্তু এখানে দুষ্কৃতকারী পাপাত্মা ভক্তিশূন্য শত্রুগণও তাহা নিরীক্ষণ করিল।

নিষ্প্রয়োজনে কোন কর্ম মূর্থও করে না, যিনি বিশ্বরূপী, তাঁহার ত কথাই নাই। এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দুর্যোধনাদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উদ্যম করে নাই। পিতা ও পিতৃব্য কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দুর্যোধন নিরন্তর হইয়াছিল। বলপ্রকাশের কোন উদ্যম করিলেও, সে বল নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তিনি স্বয়ং এতাদৃশ বলশালী যে, বল দ্বারা কেহ তাঁহার নিগ্রহ করিতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র ইহা বলিলেন, বিদুর বলিলেন, এবং কৃষ্ণ নিজেও বলিলেন। কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, কেন না, সাত্যকি কৃতবর্মা প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশীয়েরা তাঁহার সাহায্য জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগের সৈন্যও রাজদ্বারে যোজিত ছিল। দুর্যোধনের সৈন্য উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না। অতএব বলদ্বারা নিগ্রহের চেষ্টা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপুরুষ নহেন। যিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব বিশ্বরূপ প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় ক্রুদ্ধ বা দাস্তিক ব্যক্তি ভিন্ন শত্রুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে না। যিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশূন্য এবং দম্ভশূন্য।

অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাটা কুবির প্রণীত অলীক উপন্যাস বলিয়া ত্যাগ করাই বিধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

কুরুসভা হইতে কৃষ্ণ কুন্তীসম্ভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপপ্লব্য নগরে, যেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন।

যাহারা কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে। তবে কর্ণকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। সে

কথায় কৃষ্ণচরিত্র পরিস্ফুট হয়। সাম ও দণ্ডনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি। এক্ষণে ভেদ নীতিতে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিব। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ বটে, কেন না, তাঁহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই লোকাভীত।

* কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রশংসিত, এ জন্য সচরাচর আমি মূলের সহিত অনুবাদ না মিলাইয়াই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণের এই উক্তিতে কিছু অসঙ্গতি ঐ অনুবাদে দেখা যায়, যথা, যে কার্যের জন্য পাপভাগী হইতে হয় না এক স্থানে বলিয়াছেন, সেই কার্যকে কয় ছত্র পরে পাপবুদ্ধিজনিত বলিতেছেন। এজন্য মূলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম। মূলে তত অসঙ্গতি দেখা যায় না। মূল উদ্ধৃত করিতেছি

রাজন্নেতে যদি ক্রুদ্ধা মাং নিগ্হ্নীযুরোজসা।

এতে বা মামহং বৈনাননুজানীহি পার্থিব ॥

এতান্ হি সর্বান্ সংরদ্ধান্নিস্তমহম্যৎসহে।

ন চাহং নিন্দিতং কর্ম কুর্যাং পাপং কথঞ্চন ॥

পাণ্ডবার্থে হি লুভ্যন্তঃ স্বার্থান্ হাস্যন্তি তে সুতাঃ।

এতে চেদেবমিচ্ছন্তি কৃতকার্যো যুধিষ্ঠিরঃ ॥

অদৈব্য হ্যহমেনাংশ্চ যে চৈনাননু ভারত।

নিগ্হ্ন্য রাজন্ পার্থেভ্যো দদ্যাং কিং দুষ্কৃতং ভবেৎ ॥

ইদন্তু ন প্রবর্তেয়ং নিন্দিতং কর্ম ভারত।

সন্নিধৌ তে মহারাজ ক্রোধজং পাপবুদ্ধিজম্ ॥

এষ দুর্যোধনো রাজন্ যথেচ্ছতি তথাস্তু তৎ।

অহন্ত সর্বাংস্তনয়াননুজানামি তে নৃপ ॥

“কিং দুষ্কৃতং ভবেৎ” ইতি বাক্যের অর্থ ঠিক “পাপভাগী হইতে হয় না,” এমত নহে।

কথার ভাব ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, “দুর্যোধন আমাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি যদি তাহাকে এখন বাঁধিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে কি এমন মন্দ কাজ হয়?” দুর্যোধনকে বদ্ধ করা মন্দ কাজ হয় না, কেন না, অনেকের হিতের জন্য একজনকে

পরিত্যাগ করা শ্রেয় বলিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, ইহাকে বন্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে স্বয়ং এ কাজ করিলে ক্রোধবশতঃই তিনি ইহা করিতেছেন, ইহা বুঝাইবে। কেন না, এতক্ষণ তিনি নিজে তাহাকে বন্ধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ যাহাতে প্রবর্তিত করে, তাহা পাপবুদ্ধিজনিত, সুতরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিন্দিত ও পরিহার্য কর্ম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণকর্ণসংবাদ

কৃষ্ণ সর্বভূতে দয়াময়। এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিন্ধয় হইবে, তাহাতে আর কোন ক্ষত্রিয় ব্যথিত নহে, কেবল কৃষ্ণই ব্যথিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের প্রস্তাব হয়, তখন কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অর্জুন তাঁহাকে যুদ্ধে বরণ করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন না ও যুদ্ধ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া ভরসাশূন্য হইয়াও, সন্ধি স্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ট্র-সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, প্রাণিহত্যা নিবারণ হয় না। তখন রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়ান্তর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ণ মহাবীরপুরুষ। তিনি অর্জুনের সমকক্ষ রথী। তাঁহার বাহুবলেই দুর্যোধন আপনাকে বলবান্ মনে করেন। তাঁহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কর্ণকে তাহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলেই অবশ্যই তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা করিবার জন্য কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যিক।

কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল।

কর্ণ অধিরথনামা সূতের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ তিনি অধিরথের পুত্র নহেন—পালিতপুত্র মাত্র। তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার নিজ জন্মবৃত্তান্ত তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি সূতপত্নী রাধার গর্ভজাত না হইয়া, কুন্তীর গর্ভজাত, সূর্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তবে কুন্তীর কন্যাকালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুন্তী, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এ কথা কুন্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। আর কৃষ্ণ জানিতেন; তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কথাই সহজে প্রতিভাত হইত। কুন্তী তাঁহার পিতৃষসা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা হয়, অতএব কৃষ্ণের মনুষ্যবুদ্ধিতেই ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে।

কৃষ্ণ এই কথা এক্ষণে রথারূঢ় কর্ণকে শুনাইলেন। বলিলেন,

“শাস্ত্রজ্ঞেরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার সহোঢ় ও কানীনপুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননী কন্যাকালাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ, তন্নিমিত্ত তুমি ধর্মতঃ পুত্র; অতএব চল, ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও* তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।” তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি জ্যেষ্ঠ, এ জন্য তিনিই রাজা হইবেন, অপর পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকিবে।

কৃষ্ণের এই পরামর্শ সর্বজনের ধর্মবুদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে হিতকর, কেন না, তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাঁহার পক্ষে ধর্মানুমত, কেন না, ভ্রাতৃগণের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা দুর্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর, কেন না, যুদ্ধ হইলে তাঁহারা কেবল রাজ্যভ্রষ্ট নহে, সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। যুদ্ধ না হইলে তাঁহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, রাজ্যও বজায় থাকিবে, কেবল পাণ্ডবের ভাগ ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে পাণ্ডবদিগেরও হিত ও ধর্ম, কেন না যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বধ না করিয়াও, স্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম ধর্ম্যতা ও হিতকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য মনুষ্যগণের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিবে।

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে দুর্যোধনাদির রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধা তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সূতবংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং সেই ভার্যা হইতে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি জন্নিয়াছে। তাহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর তিনি ত্রয়োদশ বৎসর দুর্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন; দুর্যোধন তাঁহারই ভরসা করেন; এখন দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবপক্ষে গেলে লোকে তাঁহাকে কৃতঘ্ন, পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্যলোলুপ বা তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলিবে। এই জন্য কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না।

কৃষ্ণ বলিলেন, “যখন আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারদশা সমুপস্থিত হইয়াছে।”

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষণ্ণভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার জন্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; এজন্য আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।

* “বিরুদ্ধে”ও এই পদটি কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্তু ইহা এখানে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমার কাছে মূল মহাভারত যাহা আছে, তাহাতে দেখিলাম, নিগ্রহার্ধমশাস্ত্রাণাম্ আছে। বোধ হয় নিগ্রহার্ধমশাস্ত্রাণাম্ হইবে। তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হয়।

এই অংশ ছাপা হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে, ইহার অন্যতর পাঠও আছে, যথা-“নিগ্রহাধর্মশাস্ত্রাণাম্।” এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মর্যাদা। যথা-

“নিগ্রহো ভর্ৎসনেহপি স্যাৎ মর্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে।”-ইতি মেদিনী।

“নিগ্রহো ভর্ৎসনে প্রোক্তো মর্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে।”-ইতি বিশ্ব।

“নিয়মেন বিধিনা গ্রহণং নিগ্রহঃ।”-ইতি চিন্তামণিঃ।

নবম পরিচ্ছেদ—উপপ্লব্য

কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে ফিরিয়া আসিলে যুধিষ্ঠিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে বল।

কৃষ্ণ, নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং অন্যে যাহা বলিয়াছিল, তাই বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সকল বক্তৃতার পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা দেখিয়াছি, এখানে তাহার সহিত মিল নাই। কিছুই সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পুনরাবৃত্তি ঘটিল। তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কোন মহাপুরুষ কিছু নূতন রকম বসাইয়া দিয়াছেন বোধ হয়।

এইখানে ভগবদ্‌যান-পর্বাধ্যায় সমাপ্ত। তারপর সৈন্যনির্বাণ-পর্বাধ্যায়। ইহাতে বিশেষ কথা কিছু নাই। কতকগুলো মৌলিক কথা আছে; কতকগুলো কথা অমৌলিক বলিয়া বোধ হয়; কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা বড় অল্প। কৃষ্ণের ও অর্জুনের পরামর্শানুসারে, পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়া আসিয়া, কৃষ্ণকে কিছু মিষ্ট ভৎসনা করিলেন, কেন না, তিনি কুরুপাণ্ডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরুসভায় যাহা ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইল। ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই।

তাহার পর উলুকদূতগমন-পর্বাধ্যায়। এটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে আর কিছুই নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ। দুর্যোধন, শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে উলুককে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পাণ্ডবদিগকে ও কৃষ্ণকে খুব গালিগালাজ করা। উলুক আসিয়া ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল। পাণ্ডবেরা উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তাঁহার ন্যায় রোষামর্ষশূন্য ব্যক্তি গালাগালাজ করে না, বরং একটা রাগারাগি বাড়াবাড়ি যাহাতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবেরা উত্তর করিবার আগেই তিনি উলুককে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, “তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দুর্যোধনকে কহিবে—পাণ্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও

তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হইবে।” অথচ গালিগালাজটা কৃষ্ণার্জুনের ভাগেই বেশী বেশী রকম হইয়াছিল।

কিন্তু উলূকের দুর্বুদ্ধি, উলূক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ অক্ষম করিল। না হইবে কেন? ইনি দুর্বোধনের সহোদর। তখন পাণ্ডবেরা একে একে উলূকের উত্তর দিলেন। উলূককে সুদ সমেত আসল ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথা বলিলেন, “আমি অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়া যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে স্থির করিয়া ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হতাশনে তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমিও চরম কালে ক্রোধভরে সমস্ত পার্থিবগণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই।”

উলূকদূতগমন-পর্বাধ্যায়ে মহাভারতের কার্যের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহাতে রচনার নৈপুণ্য বা কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থানে মহাভারতের অন্যান্যাংশের সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন; অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সঞ্জয় এবং কৃষ্ণের দৌত্যের কথা আছে, কিন্তু উলূকদূতের কথা নাই। এই সকল কারণে ইহাকে আদিমস্তুরান্তর্গত বিবেচনা করি না।

ইহার পর রথাতিরথসংখ্যান, এবং তৎপরে অম্বোপাখ্যান-পর্বাধ্যায়। এ সকলে কৃষ্ণবৃত্তান্ত কিছুই নাই। এইখানে উদ্যোপর্ব সমাপ্ত।